প্রবন্ধ

# বাঙালির বিস্মৃত ধান্য সংস্কৃতি

মূল- ড. দেবল দেব ভাষান্তর- মোঃ আযাদ হোসেন

দেশী ধানের একটি জাত হারিয়ে যাওয়ার অর্থ, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতির একটি চিহ্নের বিলুপ্তি।

এশিয়ার অন্যান্য সংস্কৃতির মতো বাংলার সংস্কৃতিতে 'ভাত খাওয়া' আহার গ্রহণের সমার্থক। সংস্কৃত 'অন্ন' এবং মধ্যযুগীয় বাংলা 'ওদন' শব্দ দুটোরই অর্থ 'ভাত'। বাংলায় 'ভাত খেয়েছো' বা 'খেয়েছেন' এর অর্থ হল কেউ দুপুর বা রাতের আহার গ্রহণ করেছে কিনা সৌজন্য সহকারে জানতে চাওয়া। এই প্রাত্যহিক ভাষা বাঙালি সংস্কৃতিতে ভাতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাবেকি বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ধান, চাল ও ভাত জড়িয়ে রয়েছে। যেমন সমস্ত ঐতিহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে সুগন্ধী ধানের পোলাও এবং পায়েস পরিবেশন করা হয়।

বাংলা নার্সারি ছড়া পরম্পরাগত ধানের বিশেষ গুণাগুণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার শৈশব স্মৃতির এরকম পুরনো একটি ছড়াঃ

কলম-কাঠির পাতলা চিড়ে, হামাই ধানের খই

চিনি-আতপ চালের পায়েস, খাবে এসো সই।

অন্য একটি ছড়া জনৈক সওদাগর শিবের কাহিনি বর্ণনা করে । শিবকে তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা শালি ধানের চিড়ে ও বিন্নি ধানের খই পরিবেশন করে। সাথে শবরি কলা এবং কাগমারির একদা বিখ্যাত দই।

এই মিষ্টি ছড়াগুলি যেমন আজ সবাই ভুলে গেছে, তেমনি শবরি কলা এবং বিভিন্ন সাবেকি ধান বাংলার খাবারের থালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জৈব বৈচিত্র্যের অবক্ষয়

প্রায় চার হাজার বছর আগে বাংলায় ধান চাষ শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ সময় জুড়ে প্রাচীন কৃষকরা হাজার হাজার ধানের জাত উদ্ভাবন করেছিল। প্রতিটি জাত ছিল স্থানীয় মাটি ও জলবায়ুতে অভিযোজিত। এই পদ্ধতিকেই চার্লস ডারউইন 'কৃত্রিম নির্বাচন' বলেছিলেন। এই সাবেকি জাতগুলোর অধিকাংশই পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে চাষ করা হত। এগুলি ইন্ডিকা গ্রুপের ধান। অল্প সংখ্যক জ্যাপোনিকা গ্রুপের ধানও এই অঞ্চলে চাষ করা হত। বিশেষ করে গভীর জলা এলাকায়।

প্রাক-সবুজ বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ঠিক কতগুলি জাতের ধান চাষ হত তা নির্দিষ্ট ভাবে আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানীদের হিসেব মতো ১৯৪০ এর দশকে অবিভক্ত বাংলায় প্রায় ১৫০০০ জাতের ধানের চাষ হত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য গবেষণা কেন্দ্রের অপ্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় বিংশ শতকের ষাটের দশকে কৃষকরা প্রায় ৫৫০০ জাতের ধান ফলাত। ১৯৬৫ সালে ভারতের সবুজ বিপ্লবের আর্বিভাবে গুটি কয়েক উচ্চ ফলনশীল ধান হাজার হাজার সাবেকি জাতকে সরিয়ে দিয়েছে এবং এখনও সরাচ্ছে।

বাংলাদেশও একই ভাবে ধানের জৈব বৈচিত্র্যের অবক্ষয়ের সাক্ষী থেকেছে । ১৯৭০ এর দশকে উচ্চ ফলনশীল ধান প্রায় ৭০০০ সাবেকি জাতকে সরিয়ে দিয়েছে। পরবর্তী দশকগুলিতে আরো শত শত জাত অদৃশ্য হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এখন মাত্র ৭০০-এর কিছু বেশি জাত চাষ হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের দুপারের বাংলার অধিকাংশ সাবেকি জাতগুলি কৃষকদের হাতে আর নেই । সেগুলির মালিকানা কয়েকটি মাত্র জিন ব্যাঙ্কের হাতে। ব্রীহি বীজ বিনিময় কেন্দ্রে আমার নিজস্ব সংগ্রহে এরকম দেশী ধানের জাত রয়েছে ৫৭৬ টি। সম্ভবত এটাই ২০১২ পর্যন্ত বাংলায় চাষ হওয়া সাবেকি ধানের জাতের সর্বোচ্চ সংখ্যা । এগুলির অধিকাংশ মাঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিছু লুপ্তপ্রায় হয়ে কোনো একটি কৃষিজমিতে হয়তো টিকে আছে।

এই হাজার হাজার সাবেকি জাতের অবলুপ্তির অর্থ বিভিন্ন জাতগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কিত বিস্তৃত লোক-প্রজ্ঞারও অবক্ষয়। গরীব ও প্রান্তিক কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাও এই কারণে ঘটে। স্থানীয় মাটি ও জলবায়ুর পক্ষে উপযোগী বিবিধ ধানের জাতগুলির অধিকার কৃষকদের হাতে আর নেই। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের ধানের বিস্মৃত জাতগুলি স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতি এবং প্রসিদ্ধ বাঙালি রুচি গড়ে তুলেছিল। সেই অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলি ওই জাতগুলির সাথেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিফলন

নির্দিষ্ট ধানের জাত নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের খাদ্য সংস্কৃতি গড়ে তোলে। দঃ ২৪ পরগণার জয়নগরের মোয়া উৎকৃষ্ট সুগন্ধী ধান কনকচূড়ের খই দিয়ে তৈরি হত। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি এবং দঃ ২৪ পরগনার কৃষকরা তাদের বিখ্যাত মুড়ির জন্য কেলাস, ডহর নাগরা, নলপাই এবং মউল ধান ফলায়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কম সময়ে রান্না, উন্নত স্বাদ ও সরু দানার জন্য সীতাশাল ও বাঁশকাঠি ধানের চাষ হত। চিড়ের জন্য আজিরমান, চন্দ্রকান্ত এবং মানিক কলমা চাষ করা হত।

সাধারণ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় ধানের জৈব বৈচিত্র্য অতীব গুরুত্বপুর্ণ। এই জৈব বৈচিত্র্য লোক-পুষ্টি-প্রজ্ঞার অংশও বটে। ধানে থাকে প্রধানত শর্করা এবং খুব অল্প পরিমাণে প্রোটিন ও ফ্যাট। শুধু তাই নয়, পরম্পরাগত ধানের অনেক জাত বিটাক্যারোটিনের মতো পুষ্টির উৎস। থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন এবং নিয়াসিনের মতো ভিটামিন-বি, লৌহ এবং দস্তার মতো ধাতু ধানের কুঁড়াতে সঞ্চিত থাকে। কমপক্ষে ৮০টি জাতের প্রতি কেজি চালে ২০ মিলিগ্রাম লৌহ থাকে। এদের মধ্যে হরিণ-কাজলি, দুধে-বোলতা, ও ঝুলি ধানে সবচেয়ে বেশি প্রতি কেজিতে ১৩১- ১৪০ মিলিগ্রাম লৌহ পাওয়া গেছে। অন্যান্য জাতগুলি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ।

পুরুলিয়া জেলার ঔষধি গুণ সম্পন্ন গরীব-শাল জাতের কুঁড়ায় ভালো পরিমাণ ধাতব রূপো পাওয়া গেছে। রূপোর কণিকা রোগ জীবাণু নাশ করতে পারে। আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসায় এই ধানের ঐতিহ্যগত ব্যবহারের কারণ খুব সম্ভবত এটাই । প্রসূতি মায়েদের দুধ বৃদ্ধির জন্য দুধসর অথবা দুধেশ্বর ধান উপকারী বলে বিশ্বাস করা হয়। বাঁকুড়ার কেলাস এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূতমুড়ি ধানের ফ্যান প্রসূতি মায়েদের রক্তাল্পতা রোগ নিরাময় করে বলে লোকের বিশ্বাস। পরমাই-শাল ধান শিশুদেহের বৃদ্ধি ঘটায় আর কবিরাজ-শাল রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হত।

রোপন থেকে ঝাড়াই মাড়াই পর্যন্ত ধানের নানা কাজের সঙ্গে বহু জটিল আচার-সংস্কার জড়িয়ে আছে। শীতকালে নতুন ধান উঠলে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের পর একমাস ব্যাপী পৌষপার্বণ উদযাপিত হয়। এই উৎসবে ধানের বিভিন্ন পিঠে-পুলি তৈরি করা হয়। পরিচ্ছন্নভাবে ঝাড়াই মাড়াই করা আমন ধান পবিত্র বলে গণ্য করা হয় এবং দেবতার অর্ঘ্যের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বড়দের সম্মান ও ছোটদের আশীর্বাদ করতে ধান ব্যবহার করা হয়। উচ্চ ফলনের আশায় নানাবিধ ব্রত পালিত হয়। পৌষমাসে উদযাপিত তোষলা ব্রত এই রকম একটি ব্রত। এই ব্রতে মেয়েরা ফসল ক্ষেত ঘুরে ঘুরে দেবতার স্তুতি করে। আমন ধান ও দূর্বাঘাস দিয়ে নব বধূদের বরণ করা হয়।

নির্দিষ্ট ধানের জাতের সাথে শুধুমাত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানই যুক্ত নয়। সেই অনুষ্ঠানগুলির ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে সেই জাতগুলোও বেঁচে থাকে। জামাই নাড়ু এবং জামাই-শাল ধান জামাই এর নামে নামকরণ করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাই ষষ্ঠী উদযাপনের মধ্যে দিয়ে জামাইকে অভ্যর্থনা করা হয়। এসময় নানাবিধ বিশেষ খাবার তার জন্য পরিবেশন করা হয়। দেউলাভোগ, গোবিন্দভোগ, মোহনভোগ, মোহনরস, ওলী, রাধাতিলক প্রভৃতি ধান পায়েস ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক মিষ্টান্নের জন্য অপরিহার্য ছিল।

দেশী ধানের জাতগুলির নামকরণও মজার। উদ্ভাবক-কৃষকদের নামে সুবল-শাল, অসিত-কলমা এবং দেবদুলালী জাতগুলির নামকরণ হয়েছে। খেজুর ছড়ি ও নারকেল ছড়ি জাতগুলির পুষ্পমঞ্জরী খেজুর ও নারকেলের পুষ্পমঞ্জরীর মতো গুচ্ছাকারে সজ্জিত থাকে। অন্য কিছু জাতের নাম হয়েছে প্রাণীর নামে। যদিও এই প্রাণীগুলির সাথে তার কোনো সংযোগ নেই। যেমন- ঘোড়া-শাল, হাতিধান এবং হাতিপাঁজর, হাঁসগুজি, হনুমান জটা, মুরগী-শাল, শিয়াল-শাল, শিয়াল ভোমরা ইত্যাদি। অন্যান্য অনেক জাত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের নামে নামাঙ্কিত। যেমন – ভীম-শাল, গৌর নিতাই, লক্ষ্মণ-শাল, সীতা-শাল, মেঘনাদ-শাল প্রভৃতি। দেবতার নামেও নামকরণ প্রচুর। যেমন- বিষ্ণু-ভোগ, দুর্গা-শাল, গোবিন্দভোগ, গোপালভোগ, ইন্দ্র-শাল, কালী-আশু, কালী-কোমোদ, কার্তিক-শাল, লক্ষ্মীচূড়া, লক্ষ্মী-দীঘোল, লক্ষ্মীজটা, নরসিংহ জটা এবং ঠাকুর-শাল।

সংস্কৃতির ক্ষয়

দেশীয় ধানের সমৃদ্ধ নাম ও তার অর্থ কেবল লোক-কথায় নিহিত নেই। তাদের আনুষ্ঠানিক ব্যবহারগুলিও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। তার উল্টোটাও সত্য অর্থাৎ এই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীন শস্যের জাতগুলিকে ব্যবহার করে বিকশিত হয়েছে। পিঠে তৈরিতে গোবিন্দভোগ ও গোপালভোগ ব্যবহার না করলে লক্ষ্মী এবং নারায়ণের পূজা অশুভ হয় । বিবাহের অনুষ্ঠানে অতিথির জন্য সুগন্ধী ধানের ভাত না হলে চলে না। এই রকম পরম্পরাগত ধানের জাতগুলিকে গুটিকয়েক আধুনিক অসুগন্ধী জাত চাষ করিয়ে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ওই জাতগুলির সাথে যুক্ত অনুষ্ঠানগুলিও তাদের অর্থ হারিয়েছে।

শিল্প নির্ভর কৃষির দ্রুত আবির্ভাবের ফলে তোষলা ও পুণ্যি পুকুর ব্রত, ইতু পূজা, ইঁদ পূজা এবং নীলষষ্ঠী প্রভৃতি ধান-উৎপাদন সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত অনুষ্ঠানগুলি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। একই ভাবে জামাইনাড়ু ও জামাই-শাল ধান না থাকায় জামাই-ষষ্ঠী উদযাপন কৃষি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, মোহনভোগ অথবা ঠাকুর-শাল জাতের ধান অমিল হওয়ায় লক্ষ্মী ও সত্যনারায়ণ পূজার অনুষ্ঠানের আনন্দ ও পবিত্রতাও উধাও।

ধানের ওই সমস্ত জাত হারিয়ে যাবার ফলে উল্লিখিত আচার-সংস্কারগুলির শব্দার্থগত গুরুত্বই কেবল হারায়নি। সামাজিক ও ঐতিহাসিক পেক্ষাপটসহ বহু মূল্যবান খাবারের স্বাদ-গন্ধও হারিয়ে গেছে। সীতাভোগ ধান থেকে প্রস্তুত বধর্মান জেলার বিখ্যাত মিষ্টান্ন সীতাভোগ আজ লুপ্ত। আজকের সীতাভোগ আধুনিক ভ্যারাইটি যেমন স্বর্ণ ধানের চাল দিয়ে তৈরি হয়। নামটা কিন্তু ভুলে যাওয়া সেই ধানের নামানুসারেই রয়ে গেছে।

আরো অসংখ্য জাতের ধান স্বাদ ও গন্ধের উপযোগিতায় বিবিধ খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হত। সেগুলি আজ হয় বিস্মৃত অথবা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন দক্ষিণবঙ্গের জয়নগরের কনকচূড় ধানের খইয়ের খুব চাহিদা থাকত। কারণ খই ভাজার পরও তার মধ্যে সেই ধানের সুগন্ধ পাওয়া যেত। কনকচূড়ের চাষ-এলাকা দ্রুত কমে যাওয়ায় আধুনিক অসুগন্ধী ধানের তৈরি নকল ‘জয়নগরের মোয়া’ বাজার জাত হতে থাকে ।

সাবেকি ধানের জৈব বৈচিত্র্যের দ্রুত অবক্ষয়ের ফলে বাংলার গ্রামীন ভূচিত্রের দৃশ্যগত সৌন্দর্য্যও হারিয়েছে। ধানের খড় দিয়ে নির্মিত নয়নাভিরাম কুঁড়েগুলি আর দেখা যায় না। এখন গ্রামের কুঁড়ের ছাদ এসবেসটস বা টিনের – যা এদেশের আবহাওয়ার চূড়ান্ত অনুপযোগী। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ নতুন জাতের ধানগুলির খড় অনেক বেঁটে এবং কম টেকসই। দেশি জাতের খড় এজাতীয় চালার পক্ষে উপযোগী ছিল। আধুনিক বাংলার ধানের জৈব

বৈচিত্র্য নষ্ট হবার পরিণামে বাঙালি জীবনের জড়-উপকরণও যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেই দিকটি লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে গেছে।

অর্থনীতিবিদ ও ভূ-বিদরা জমির ব্যবহার পরিবর্তনের কথা বললে প্রাকৃতিক ভূচিত্র মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেই প্রক্রিয়ার কথা বলেন। জোরটা থেকে যায় অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য জমির ব্যবহারের উপর । শস্যের জৈব বৈচিত্র্য ধ্বংসের অতিরিক্ত পরিণাম, সেই জৈব বৈচিত্র্যের সাথে ওতপ্রোত যুক্ত স্থানীয় সংস্কৃতির অবলুপ্তি। এই দিকটি অনালোচিতই থেকে যায়।

হাজার হাজার সাবেকি জাত ও তার সাথে ওতপ্রোত যুক্ত সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা হারানোর অনিবার্য পরিণাম শব্দ, বাক্যাংশ ও ভাষার কথ্য পরম্পরার ধ্বংস সাধন। আর্থসামাজিক অপ্রাসঙ্গিকতা ও সাংস্কৃতিক অর্থহীনতার কারণে বাঙালি ঐতিহ্যের বহু রীতি ও আচার-সংস্কার ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত । এক সময় এগুলিই বাঙালি সংস্কৃতির আত্মপরিচিতি গড়ে তুলেছিল।

( ড. দেবল দেব প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী এবং ইকোলজি-বিশেষজ্ঞ। তিনি দেশীয় বীজের বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজে অনলস যুক্ত। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বসুধা গবেষণা ফার্মের তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্রীহি ধান বীজ ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠাতা। নিবন্ধটি **Forgotten Food** শিরোনামে ৬ মার্চ ২০২১, ***Scroll*** ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। **Forgotten Food : Culinary Memory , Local Heritage and Lost Agricultural Varieties in India** শীর্ষক প্রজেক্টের অংশ এই নিবন্ধটি। )


## :: ভয়েস মার্ক ::

- দ্বি-মাসিক পত্রিকা -

সম্পাদক: মোঃ আযাদ হোসেন

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯১

পাণ্ডুলিপি (ম্যানুস্ক্রিপ্ট) প্রস্তুতি ও সম্পাদনা : মোঃ মিনারুল হক

নামলিপি ও প্রচ্ছদ চিত্র: হিমাদ্রী শেখর মজুমদার


সত্বাধিকার: ভয়েস মার্ক কালচারাল গ্রুপ

RNI Ref. Number: 1343240

## -: যোগাযোগ :-


**সম্পাদকীয় দপ্তর:**
ভগবানপুর , আষাঢ়িয়াদহ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
পিন - ৭৪২১৪৮

9932837185/ 9735874385

azadm.1981@gmail.com, voicemark19@gmail.com

www.voicemark.in